পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী, জীবনাদর্শ বলতে কি বোঝায় তা কি তুমি জানো? জীবনাদর্শ বলতে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে এমন কিছু ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যাদের জীবন আদর্শ জীবন এবং যাদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। তুমি কি এমন কোনো ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে পারো যার জীবন থেকে তুমি ভালো কাজ, ভালো আচরণ এবং সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির শিক্ষা নিতে পারো? জীবনাদর্শ অধ্যায়ের পাঠে প্রবেশের আগে সহপাঠি বন্ধুদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে নাও। কিভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

(নবুয়ত থেকে হিজরত পর্যন্ত)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম থেকে নবুয়ত পর্যন্ত জীবনচরিত সম্পর্কে জেনেছি। আজ নবুয়ত পরবর্তী প্রিয়নবি (সা.)-এর মক্কার কাফের-মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দিদার লাভে মিরাজ গমন এবং মদিনায় হিজরতসহ আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব।

গোপনে ইসলাম প্রচার

মহানবি (সা.) নবুয়ত লাভের কিছু দিন পরে আবার তাঁর প্রতি ওহী পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা বললেন –

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

অর্থ: 'হে রাসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন।' (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬৭)

মহান আল্লাহর এ নির্দেশের পর মহানবি (সা.) আরববাসীকে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রথমে তিন বছর তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। হযরত খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর বয়স্কদের মধ্যে তাঁর একান্ত সহচর আবু বকর (রা.), বালকদের মধ্যে হযরত আলী ও যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

নবুয়তের তিন বছর পর প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহান আল্লাহর নিকট থেকে ওহী আসলো। আল্লাহ বললেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থ: 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।' (সূরা শুআরা, আয়াত: ২১৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর এ নির্দেশনা পেয়ে মক্কাবাসীদের সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের অপর দিকে শত্রুপক্ষ রয়েছে। তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত। তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি আসন্ন কঠিন শাস্তির ব্যাপারে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তখন আবু লাহাব (আল্লাহ তার প্রতি লা'নত বর্ষিত করুন) বলে উঠল, আজই তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি এজন্যই আমাদের এখানে ডেকেছিলে? আবু লাহাবের এ আচরণে রাসুল (সা.) অনেক কষ্ট পান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (সা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন।

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের পর থেকেই মক্কার কুরাইশরা মহানবি (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তারা মুসলমানদেরকে বন্দী করে রাখা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট দেওয়া, প্রহার করা, লৌহদণ্ড গরম করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ দেয়া, প্রখর রৌদ্রে মরুভূমিতে চিৎ করে শুইয়ে পাথর চাপা দেওয়াসহ নানা প্রকারের অমানবিক নির্যাতন চালাতে থাকে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)। তাদের বর্বর নির্যাতনে হযরত আম্মারের মা সুমাইয়া (রা.) সর্বপ্রথম শহীদ হন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হযরত বেলাল (রা.)-এর মুনিব তাঁকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করেন। তারা প্রিয়নবির পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত, তাঁকে প্রস্তর মারত। কিন্তু তাদের অকথ্য অত্যাচারের পরেও তৌহিদের পথ থেকে কেউ বিচ্যুত হননি; তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

আবিসিনিয়ায় গমন

নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন দেখে প্রিয়নবি (সা.)-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি কুরাইশদের অমানবিক নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য অসহায় নওমুসলিমদেরকে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে নবুয়তের পঞ্চম বছর রজব মাসে হযরত উসমান ও তাঁর স্ত্রী রাসুল (সা.)-এর কন্যা রোকাইয়াসহ ১১জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিছু দিন পর দ্বিতীয় ধাপে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ আরও ৮৩ জন মুসলমান সেখানে আশ্রয় নেন। কুরাইশরা আমর ইবন আসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আশ্রিত মুসলিমদেরকে তাদের হাতে সমর্পণের অনুরোধ করে। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাসী মুসলমানদের কথায় মুগ্ধ হয়ে কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে আবিসিনিয়া থেকে বের করে দেন।

কুরাইশদের বয়কট ও দুঃখের বছর

কাফির-মুশরিকদের নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বনূ হাশিম ও বনূ আব্দুল মুত্তালিবের লোকজন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এ ছাড়া ইতোমধ্যে মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচা হামযা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে উপয়ান্তর না পেয়ে কুরাইশরা মিলে মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলো। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার ও অনুসারীদের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে শিয়াবে আবু তালেব নামক নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় আশ্রয় নিলেন। খাদ্য-পানীয় চরম সংকটসহ ভীষণ দুঃখ-কষ্টে তাঁদের দিন কাটে। এভাবে ৩ বছর কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পরেও তাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারালেন না। অবশেষ ৩ বছর পর কুরাইশরা তাদের প্রত্যাহার করল।

কুরাইশদের থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নবুয়তের ১০ম বছরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) ও অভিভাবক চাচা আবু তালেব দুজনেই ইন্তেকাল করেন। তাঁরা ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শক্তি ও সাহায্যকারী, সত্যিকারের বন্ধু ও পরামর্শদাতা, বিপদে আপদে রক্ষাকর্তা। তাদের অভাবে মহানবি (সা.) ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এ সুযোগে কাফেররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। প্রিয়নবি (সা.)-এর একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু এবং এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের জন্য এ বছরকে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলা হয়।

তায়েফ গমন

চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা মহানবি (সা.)-এর উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাকে প্রস্তরাঘাতে রক্তরঞ্জিত করল। তারা জঘন্য অত্যাচার করে তাঁকে পাগল বলে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল।

রাসুল (সা.)-এর মিরাজ

মিরাজ অর্থ উর্ধ্ব গমন, ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাইল এর প্রারম্ভে এই ইসরা ও মিরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বজন হারানোর বেদনা ও কাফিরদের অব্যাহত নিষ্ঠুর আচরণের এই দুঃসময়ে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.) কে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সৃষ্টির অপার রহস্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁর দিদারে প্রিয় নবির মনকে আনন্দে ভরে দেন। এই পর্বটিকেই মিরাজ বলা হয়। মিরাজ রাসুল (সা.)-এর জীবনে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাসুল (সা.) নবুয়তের ১০ম বা ১১শ বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখ গভীর রজনীতে বোরাক নামক বেহেশ্তি বাহনে চড়ে কাবাগৃহ হতে জেরুজালেমে বাইতুল মাকদাস এবং পরে সেখান থেকে উর্ধ্বালোকে গমন করে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করেন। মিরাজের রজনীতেই প্রিয়নবি (সা.)-এর উম্মতদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

আকাবার শপথ

নবুয়তের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময়ে ইয়াছরিব (মদিনার পূর্ব নাম) থেকে আগত ১২ জনের একটি দল রাসুল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আকাবা উপত্যকায় মহানবি (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা এক আল্লাহর উপাসনা করা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকার শপথ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই শপথকেই আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়।

আকাবার প্রথম শপথের পরবর্তী বছরে ৬২২ খ্রি. মদিনা হতে ৭৫ জনের একটি দল (৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা) এসে রাসুল (সা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রিয়নবিকে তাঁদের দেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এ ছাড়াও তাঁরা ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রকার সাহায্য এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই আকাবার দ্বিতীয় শপথ। ইসলামের ইতিহাসে আকাবার শপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মদিনায় হিজরত

আকাবার শপথের পর মদিনায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। মদিনার মনোরম প্রকৃতি ও ইসলাম প্রচারের অনুকুল পরিবেশের জন্য মহানবি (সা.) সেখানে হিজরতের জন্য মনস্থির করেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা দারুন নদওয়া বৈঠকে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। অবশেষে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের জন্য মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) এ হিজরতের সময়ে সঙ্গী ছিলেন।

মহানবি (সা.) এর মাক্কী জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় :

- সকলের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া;
- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা;
- বিপদে আপদে সর্বদা ধৈর্যধারণ করা;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা;
- শত্রু হলেও তার আমানত রক্ষা করা;
- নামাজ আমাদের জন্য মহান আল্লাহর উপহার, তাই ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করা।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মহানবি (সা.)-এর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আমানতদারিতা প্রভৃতি গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করবে ও নিজেদের মধ্যে এসব গুণের অনশীলনের চেষ্টা করবে।

হযরত ইসমাঈল (আ.)

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মহান পূর্বপুরুষ। তিনি পিতা ইবরাহিম (আ.) এর সাথে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা ইসমাঈল (আ.)-এর জীবন ও চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত সন্তান। তাঁর জন্মের সময় পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বিবি হাজেরা মিসরের কিবতী রাজবংশীয় মহিলা ছিলেন। ইবরাহিম (আ.)-এর বৃদ্ধ বয়সে মহান আল্লাহর নিকট দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাঁকে উক্ত পুত্রসন্তান দান করেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। অতএব আমি তাকে অতিসহনশীল এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম।' (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০০-১০১)

নির্বাসন ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাকে মক্কার ফারান পর্বতের উপত্যকায় বিজন ভূমিতে একটি বড় গাছের নিচে রেখে আসেন। বস্তুত এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা। তিনি তাঁদের খাবারের জন্য এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাদের খাদ্য-পানীয় ও হেফাজতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

বিবি হাজেরা তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের পানি ও খাবার ফুরিয়ে যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল পানির পিপাসায় ছটফট করতে থাকেন। তিনি শিশুর কান্না সহ্য করতে না পেরে পানি ও খাবারের সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন। এ পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটির পরেও কোথাও পানি কিংবা খাবার পেলেন না। অবশেষে ইসমাঈলের কাছে ফিরে এসে দেখতে পান যে, আল্লাহর অসীম কুদরতে শিশু ইসমাঈলের পায়ের আঘাতে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এটাই হলো জমজম কূপের উৎস। হযরত হাজেরা (আ.) ঐ কূপ থেকে নিজে এবং তার শিশুপুত্র ইসমাঈলকে পানি পান করান। তিনি মশক ভরে পানি রাখলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

কুরবানি

ইসমাঈল (আ.) যখন ১৩ কিংবা ১৪ বছরের যুবক, তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানির জন্য আদিষ্ট হন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কঠিন পরীক্ষা। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে বললেন, 'হে আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কুরবানি করছি। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? তখন তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) মিনা প্রান্তরে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে শুরু করলেন। এমন সময় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০৫)। আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর স্থলে একটি সাদা দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাঈল (আ.) দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি ইসমাঈলকে এক মহান যবেহের বিনিময়ে মুক্ত করলাম এবং একে আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলাম।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০৭-১০৮) এ স্মৃতির সম্মানার্থে কুরবানি করা উম্মতে মোহাম্মাদির উপর ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

কাবাঘর সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ এবং পরে হযরত আদম (আ.) পুনর্নিমাণ করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর সহযোগিতায় কাবা ঘর পুনর্নিমাণ করেছিলেন। কাবা ঘর নির্মাণের পর তাঁরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' (সূরা আল বাকরা, আয়াত: ১২৭)।

ইসমাঈল (আ.)-এর গুণাবলি ও মহত্ত্ব

কুরআন মাজিদে ইসমাঈল (আ.)-এর সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ওয়াদা পালন, সালাতের হেফাজতকারী, পরিবারকে সালাত আদায়ের নির্দেশদানকারী এবং আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রশংসায় পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরার ২৫টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন যাবীহুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী।

তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষী ছিলেন। নবি (সা.) বলেন, সর্বপ্রথম 'স্পষ্ট আরবি' ভাষা ব্যবহার করেন হযরত ইসমাঈল (আ.) তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ) ইসমাঈল (আ.) ছিলেন কুরাইশী আরবি ভাষায় ওহীপ্রাপ্ত প্রথম নবি। এটি ইসমাঈল (আ.) এর জন্য একটি অনন্য গৌরবের বিষয়। এ জন্য তাঁকে আবূল আরাব (أَبُوالعَرَب) বা আরবদের পিতা বলা হয়।

উপাধি

বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একটি নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। সে লোকটি কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর তৃতীয় দিন লোকটির সাথে তাঁর সেখানে দেখা হয়। (ইবনে কাছির) নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা সাদেকুল ও'আদ বা অঙ্গীকার পালনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কুরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তিনি ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর রাসুল ও নবি।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৪)

মৃত্যু

হযরত ইসমাঈল (আ.) ১৩৭ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ)। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তাঁকে কাবার হাতীমে তাঁর মা হাজেরার কবরের পাশে দাফন করা হয়।
মহান আল্লাহর প্রতি ইসমাঈল (আ.)-এর অগাধ বিশ্বাস ও আনুগত্য, ত্যাগ এবং পিতৃভক্তি, অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা হযরত ইসমাঈল (আ.) এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলি সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করবে এবং একটি পোস্টার তৈরি করবে।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী। অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তিনি মুসলমানদের বিশেষ করে নারী সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। এ ছাড়াও কুরআন, হাদিসে এবং ফিকহ বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

জন্ম ও শৈশব

প্রসিদ্ধ মতে তিনি নবুয়াতের চতুর্থ বছরে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবুবকর (রা.) এবং মাতা উম্মে রুম্মান। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কথাবার্তা সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

মহানবি (সা.)-এর সাথে বিবাহ

নবুয়াতের দশম বছরে মহানবি (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী যার ঘরে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল। স্ত্রী হিসেবে তাঁকে গ্রহণের মাঝে ইসলামের প্রভূত কল্যাণ ও হিকমত নিহিত ছিল।

শিক্ষা জীবন

পিতার কাছেই শিশু হযরত আয়েশা (রা.)-এর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। তিনি পিতার নিকট থেকে কুষ্টিবিদ্যা ও কাব্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন। এ ছাড়া পিতার কাছে তিনি কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থলি বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন।
তাঁর কৈশোর ও যৌবনের পুরোটা সময় কেটেছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবি (সা.)-এর একান্ত সান্নিধ্যে। তাই মহানবির সাহচর্যে তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ক জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নারীদের একান্ত বিষয়সমূহ তিনি মহানবি (সা.) এর কাছে জেনে অন্যদের শিক্ষা দিতেন।

ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসুল (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যান। এতে তাঁর ফিরতে দেরি হয়। এ সুযোগে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ, হামনাহ প্রমুখ মুনাফিক তাঁর বিরুদ্ধে গুজব ছড়াতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এটি ‘ইফকের ঘটনা’ বলে পরিচিত। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পিতামাতা চরম উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান। ফলে মহান আল্লাহ সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাজিল করে আয়েশা (রা.)-এর নির্দোষ ও পবিত্রতা ঘোষণা করেন। এভাবে মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো এবং তাঁর মর্যাদাও পবিত্র কুরআনে স্থান পেল।

ইসলামি জ্ঞান প্রসারে অবদান

ইসলামি শিক্ষা প্রচার ও সম্প্রসারণে আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি, অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনসহ পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ইবাদাত, পরকাল সর্বোপরি শারঈ সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি। অসংখ্য সাহাবি ও তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারীদের বিভিন্ন বিষয়ের বিধান বর্ণনায়ও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে একসাথে ২০০ এর অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করতেন। মুসতাদরাক আল-হাকেম গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আয়েশা (রা.) থেকে শরিয়তের এক-চতুর্থাংশ বিধি-বিধান বর্ণিত আছে।

গুণাবলি

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাশক্তিসম্পন্ন, বিদুষী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, তেজস্বিনী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, শিক্ষয়িত্রী, সত্যের সাধিকা, অগ্নিবর্ষী বাগীশ, সচ্চরিত্রা, মধুর আলাপী, ধৈর্যশীল, আদর্শ স্ত্রী, জ্ঞানতাপস ও সদালাপী। এক কথায় মানবীয় চারিত্রের সকল গুণই তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল মুমিনা ছিলেন। তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। তাঁর সতীত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁর উসিলায় তায়াম্মুমের বিধান চালু করেন।

তিনি বছরের অধিকাংশ সময়ই রোযা রাখতেন এবং রাত্রি বেলায় আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগিতে নিজেকে মশগুল রাখতেন। দান-সদকা করতে তিনি পছন্দ করতেন। অসহায়, ফকির, মিসকিনকে কিছু দান করতে পারলে তিনি তৃপ্তি পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, পরোপকারিতা, ধর্মপারায়ণতা, দয়াসহ সর্বপ্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন।

মর্যাদা

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহানবি (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'নারী জাতির উপর আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর উপর সারিদের মর্যাদা।'(বুখারি ও ইবনে মাজাহ) সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য যা রুটি-গোশত ও ঝোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসুল (সা.) আরও বলেন, 'আয়েশা (রা.) হলেন মহিলাদের সাহায্যকারিণী।' (কানযুল উম্মাল)

একবার আমর বিন আস (রা.) রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন, তাঁর বাবা।' (বুখারি) সুতরাং এ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ইন্তেকাল

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ জুলাই ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত আয়েশা (রা.)- এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলি ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

হযরত উমর (রা.)

হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের বিখ্যাত আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। তিনি কুরাইশ বংশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আর মাতার নাম খানতামা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগিরার কন্যা। হযরত উমর (রা.) শিক্ষা-দীক্ষায় সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কবিতা লেখায় পারদর্শী ছিলেন। কুস্তিবিদ্যায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে হযরত উমর (রা.)-এর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের অমানুষিক নির্যাতন করতেন। তাঁর গৃহপরিচারিকা লুবানা ইসলাম কবুল করলে তিনি তাকেও নির্যাতন করেন। একদা তিনি তরবারি নিয়ে মহানবি (সা.) কে হত্যার জন্য ছুটলেন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি গতি পরিবর্তন করে বোনের বাড়িতে যান এবং

বোন ও ভগ্নিপতিকে প্রচণ্ড মারতে থাকেন। তখন তারা কুরআন পাঠ করছিলেন। তাদের শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ়তা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী পড়ছিলে? উমরের বোন জবাব দিলেন, কুরআন পড়ছিলাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমাকে দেখাও। বোন বললেন, তুমি অপবিত্র। অপবিত্র হাতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। বোনের এ কথা শুনে উমর (রা.) পবিত্র হয়ে এলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বাহা ও হাদিদের আয়াতগুলো পড়লেন। মহান আল্লাহর বাণী তাঁর মনের ভিতর তোলপাড় সৃষ্টি করে দিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। উমর (রা.) বললেন, নবিজি কোথায়? আমি তাঁর কাছে যাব, মুসলমান হবো। এরপর তিনি প্রিয়নবির কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবি (সা.) দোয়া করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আবু জাহাল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব এ দুজনের একজনকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’ তাঁর ইসলাম গ্রহণ মূলত মহানবি (সা.)-এর উক্ত দোয়ারই ফল। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) কা‘বার সামনে প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ঘোষণা দিলেন। নবি (সা.) উমর (রা.)-এর উপর খুশি হয়ে তাঁকে ‘ফারুক’ বা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধিতে ভূষিত করলেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজের ধন-সম্পদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাবূক অভিযানে তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়। তিনি সকল যুদ্ধে মহানবি (সা.)-এর সাথি হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালনকালে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন, বিচার ও অর্থ ব্যবস্থায় বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উমর (রা.) ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁর কাছে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদ্য পানের অপরাধে নিজ পুত্র আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।
তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অর্ধজাহানের খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত দীনহীন ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি সাথে কোন দেহরক্ষী রাখতেন না। বায়তুল মাল থেকে তাকে যে ভাতা দেওয়া হতো, তা-ও ছিল একেবারে নগণ্য। খাওয়া-দাওয়া করতেন একেবারে সামান্য। শুধু খেজুর ও রুটি দিয়ে আহার সম্পন্ন করতেন। খেজুর পাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন।

তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাদাসিধে। তিনি তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। জেরুজালেমের খ্রিষ্টান শাসকের আহ্বানে তিনি একবার সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর ভৃত্য পালাবদল করে উটে আরোহণ করে জেরুজালেম পৌঁছান। উট যখন জেরুজালেম পৌঁছাল, তখন উটের পিঠে ছিল ভৃত্য আর খলিফা রশি ধরে হেঁটে আসছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ধুলো মলিন ছিন্নবস্ত্র। খলিফার এই পোশাক ও অবস্থা দেখে খ্রিষ্টান শাসক ও অন্যান্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে যেমন ইস্পাতসম কঠিন ছিলেন, তেমনি মানুষের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে ছিলেন মোমের মতো নরম। তিনি সাধারণ প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট জানার জন্য গভীর রাতে একাকি পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন গভীর রাতে এক গৃহে ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তখন তিনি বায়তুল মাল থেকে নিজ কাঁধে আটার বস্তা বহন করে সেই বাড়িতে গমন করেন। শিশুদের রুটি বানিয়ে খাওয়ানোর পর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। তিনি বলতেন– 'যদি ফোরাত নদীর তীরে কোনো ছাগলের বাচ্চাও মারা যায়, এ বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রমনা ও সুশাসক। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে করতেন। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করতেন।

তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। তিনি শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কে একজন সাধারণ লোকের কাছেও জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি একদা জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলেন যে 'বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয়নি, অথচ খলিফার গায়ে সে কাপড়ের পুরো একটি জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন?' তখন খলিফার পক্ষে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ জবাব দিলেন 'আমি আমার প্রাপ্য অংশটকু আব্বাকে দিয়েছি। তাঁর ও আমার দুটুকরা মিলিয়ে তাঁর জামা তৈরি করা হয়েছে।' মানবতার ইতিহাসে একজন শাসকের এরুপ জবাবদিহির ঘটনা সত্যি-ই বিরল। আমাদের সমাজব্যবস্থায় শাসকদের জন্য এরুপ জবাবদিহির সুযোগ করা গেলে আশা করা যায় তারাও এ আদর্শে আদর্শবান হতে পারবেন।

হযরত উমর (রা.) একজন শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। ইসলামের খেদমতে তিনি অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা, মদিনা , সিরিয়া , কুফা, বসরাসহ যেখানেই জয়লাভ করেছেন সেখানেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হযরত উমর (রা.) সৃষ্টিকুলের ভাষাহীন পশু-পাখি ও প্রাণীদের প্রতি অত্যন্ত দরদি ছিলেন। এরূপ পশুদের প্রতি কেউ জুলম করে কি না, এরূপ প্রাণিকুল অনাহারে থাকে কি না খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি বলতেন– 'এরাও মহান আল্লাহর সৃষ্টি। প্রতিটি প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করা পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ।'

মোট কথা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। মানব চরিত্রের সকল ভালো গুণ ও মহান আদর্শের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আমরা তাঁর জীবনাদর্শ ভালোভাবে জানব এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়তে সচেষ্ট হবো।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা হযরত উমরের চরিত্রের কঠোরতা ও কোমলতা সম্পর্কে আলোচনা করবে। ইসলাম সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে– হযরত উমরের জীবনাদর্শ অবলম্বনে বিষয়টি আলোচনা করবে।

খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)

হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) ছিলেন আল্লাহর একজন ওলী ও ইসলামের একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। আজ আমরা এ মহান সাধকের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও পরিচয়

খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) ৫৩০ হিজরি সনে পারস্যের ইস্পাহান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাজা গিয়াস উদ্দীন হাসান এবং মাতা উম্মুল ওয়ারাহ। তাঁরা ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এ জন্য তাঁর মা শৈশবে তাঁকে শুধু হাসান নামেই ডাকতেন। তাঁর পিতা ইসলামের একজন মহান সাধক ও সিস্তানের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে পিতৃ ও মাতৃহারা হন। তিনি গরিবে নেওয়াজ নামে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

কুরআন মাজিদ শিক্ষার মাধ্যমেই খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজিদ হেফয করেন। এরপর তিনি খোরাসানের বিখ্যাত আলেমদের নিকট তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইলম ও মারিফাতের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি বুখারা গমন করে কুরআন, হাদিস, শরিয়াত ও মারিফাতের জ্ঞানার্জন করেন। ২২ বছর বয়সে তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে শরিয়াত, মারিফাত, তরিকত ও হাকিকতের বাতিনী ফায়িয লাভ করেন। ৩২ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ উসমান হারুনীর (রহ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে তিনি চিশতীয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে আগমন ও ইসলাম প্রচার

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) স্বপ্নযোগে মহানবি (সা.)-এর নির্দেশ পেয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৯০ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়। তিনি ভারতের আজমিরে এসে ইসলামের আলো ছড়ানোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মারিফাত চর্চার নামে সমাজ-সংসার ত্যাগ করেননি। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য আজমির, বাদায়ুন, বেনারস, কনৌজ ও বিহার প্রভৃতি স্থানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের বর্ণ প্রথার অমানবিকতা থেকে নিম্ন বর্ণের মানুষদের রক্ষার চেষ্টা করেন।

ইন্তেকাল

ইসলামের এ মহান সাধক ৬৩২ হিজরী ৬ রজব ইন্তেকাল করেন। ভারতের আজমিরে তাঁর মাজার রয়েছে।

আমাদের জন্য শিক্ষণীয়

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও সমাজকে কখনও আলাদাভাবে চিন্তা করতেন না। এ জন্য তিনি সমাজ-সংসার ও রাজনীতির সাথেও যুক্ত থেকে মানব কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি একাধারে একজন সাধক, শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন। আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে শরিয়াতের চর্চার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা চর্চার শিক্ষা পাই।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করবে।

এই অধ্যায়ে আমরা যেসকল ব্যক্তি সম্পর্কে জানলাম তাঁরা প্রত্যেকেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাদের জীবন থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। এখন তোমার কাজ হল সপ্তম শ্রেণিতে যে জীবনাদর্শগুলো তুমি পাঠ করলে সেগুলো থেকে কোন কোন নৈতিক এবং মানবিক গুণাবলি তুমি খুঁজে পেয়েছ তা নির্ণয় করা এবং সেগুলো নিজের জীবনে চর্চা করার পাশাপাশি অন্যকে চর্চা করতে অনুপ্রাণিত করা। এই কাজটি কিভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে দিবেন।